শান্তিনিকেতন

(প্রথম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

সূচী

শান্তিনিকেতন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় ত ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্ত্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে! সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্ম্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কি করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়বার মত জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে

জড়িয়ে রয়েচে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুল্‌ব কি করে! ওরে, "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!"

দিন যখন নানা কর্ম্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুল্‌তে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত," এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠ্‌তে থাকে তাহলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে;—তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের

আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারিদিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি—তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজ্‌তে থাকে ওরে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত!"

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভাল। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে—তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মত অজ্ঞান আর ত কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানিনে, তাঁকে যে পাইনি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত! সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক্! আমি বুঝচিনে আমি পাচ্চিনে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠ্‌তে পারে। মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক্ "সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নাই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত করে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই বলে' কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্ব্বাসিত করে দেখ্‌চি। আমরা এমন ভাবে

গৃহে এবং সমাজে বাস করচি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকাল বেলায় আশ্চর্য্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যা-তলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্ত্তি অনুভব করিনে। এই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘর বাড়ির মধ্যেই সঙ্কীর্ণ করে দেখ্‌তে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাইনি—নিজের

ঘরেই জন্মেছি—এখানে আমি আমি আমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই—তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনো দিন এমন করে চলিনে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চেন সেই মহাসারথী। আমিই ঘরের কর্ত্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাংবামাত্রই সেই চিন্তাই সুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের জন্য আবৃত করে। "আমির" দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসম্বাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়! কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার

করার মত নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে! আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে-দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসঙ্কোচে নিজে জুড়ে বস্‌বার যে স্পর্দ্ধা, সেই স্পর্দ্ধা আপনাকে আপনি জানেনা বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্দ্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানিনে এটাও জান্‌তে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনি জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুইবাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাইনে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চল্‌বে

না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্চিনে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ি সম্পূর্ণ ছাড়চে না অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করচে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনো কোনো মীমাংসা হয়নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্ব্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার একদিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিমুক্ত সত্য অন্যদিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করচে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করচে। সে মনে করচে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো

পরিণাম নেই, কেননা সে ত সম্মুখে পরিণামকে দেখ্‌তে পাচ্চে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মত নিজের আবরণকেই চারদিকে অনুভব করচে।

আসুক্ সেই অসহ্য বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদ্‌তে থাক—সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠেনি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল—তার ভার যে চব্বিশঘণ্টা নাড়ীতে নাড়ীতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যে দিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাইনে; সেদিন আমরা একমুহূর্ত্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা

এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে!"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানিনে কখন্? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখনা এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানিনে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয় স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেন না এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য,

আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মত সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্ব্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কি? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাক্‌লেই বা কি না থাক্‌লেই বা কি? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এই জন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন

তাঁকেই সকলের চেয়ে পাইনে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এত বড় প্রকাণ্ড না থাকা আমাদের পক্ষে আর কি আছে! এই না থাকার ভারে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই মরচি। এই না থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই এত বড় ক্ষতি কি দিয়ে পূরণ হবে! কিছুতেই কিছু হচ্চে না। দিনে রাত্রে এই জন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—

প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে!

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলচি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি শিকি পয়সাও হত তাহলে তখনি সতর্ক হয়ে উঠ্‌তুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য্য আমাদের আলো দিচ্চে পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্চে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেচে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জ্জিত করে আমাদের কি অভাব হচ্চে! হায়, যে অভাব হচ্চে তা যতক্ষণ না জান্‌তে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে' মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কি হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালক কালে মাতৃহীন। আমার বড় বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন ত আছেন—তাঁর আবির্ভাব ত সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে একমুহূর্ত্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠ্‌ল যে মা আছেন। তখনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বল্লেন "তুমি এসেচ ?"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগ্‌লুম—মায়ের বাড়িতেই বাস

করচি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এম্‌নি ভাবেই সংসার চল্‌চে। তাতে ক্ষতিটা কি হচ্চে! তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেষণ করচেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো তাঁর পাখা আমাকে বীজন করচে। কেবল ঐটুকু হচ্চে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বল্‌চেন না, তুমি এসেচ! অন্ন জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শ টি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায় তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভাল করে ভেবে দেখ, জগতে কোনো জিনিষের কাছে কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ

আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ একমুহূর্ত্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয় ত সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিষের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসচে খেলচে গল্পগুজব করচে, নানা লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা আনাগোনা চল্‌চে তারা ভাবচে এই ত আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই—সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোন সঙ্গীর চষমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলাম —অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্চি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত

তুলে ধরে বলে তুমি এসেচ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করচে, কিন্তু আমাদের হাত ধরচে না, আনন্দিত হয়ে বলচে না, তুমি এসেছ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলচে না, তুমি এসেচ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করচি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের

বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনি পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে—তখনি মানুষ সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কি আশ্চর্য্য সার্থকতা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানিনে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাইনে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনি আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জান্‌তে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের

আত্মা যখন সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখিনে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখিনে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—

সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেই খানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারিনে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বল্‌ত তুমি এসেচ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কি তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন। এই যে সর্ব্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্ব্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনি সে সর্ব্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে পৌঁছলে সে দ্বারে এসে

ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্ব্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই ত আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলচি এটা ত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে ত এটা হবে না। চেতন ভাবেই ত চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন ত আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ পথ খুলে যাচ্ছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্চে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিল্‌তে পাচ্চি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্চে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত

হয়ে আস্‌চে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আস্‌চে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্চে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করচিনে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্চে।

পাপ

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না তখনি পাপ জিনিষটা কি তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরণার মত ছুটে বেরতে চায় তখনি পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে উঠ্‌তে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চল্‌তে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোট নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্ব্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক

ভালমন্দ সুবিধা অসুবিধার জিনিষ বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য্য হলেই আমাদের মনে আর কোন সঙ্কোচ থাকে না; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে তখন সে দেখ্‌তে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা করা নয়—প্রয়োজন আরো বড়, বাধা আরো গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্চে না, কারো চোখে পড়চে না; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদে সেখানে পদে পদে

ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্ব্বে যে পাপটি চোখে পড়েনি তাকেও দেখ্‌তে পাই এবং পাপ জিনিষটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কি রকম বাধা তাও বুঝ্‌তে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি— তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চল্‌বে না— লোকের কাছে ভাল হয়ে আর কোন সুখ নেই—তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্ম্মল স্বরূপকে বল্‌তে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর কর—একেবারে বিশ্বদুরিত—সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাক্‌লে

চল্‌বে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়—সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্ব্বগ, তোমাকে, সর্ব্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হব, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব সেই আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে, যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জান্‌তে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুক্‌ল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্ম্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্তশয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল,

তখন নিজের নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিঃশ্বাস রোধ করতে লাগল; তখন ত আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্ম্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্য সঙ্গীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্ত্তাবহকে প্রেরণ কর—তাহলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে আর সুস্থির হতে দেবেনা, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!

২৫শে অগ্রহায়ণ

দুঃখ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায়চ ময়োভবায়চ—সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারিনে। কল্যাণ-কর যে শুধু সুখকর ন'ন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দ্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলি লুকিয়ে থাক্‌তে চাই। তাতে কি হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কি হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগ্‌ড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এই জন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মত হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলি বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না।

পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে ;— সে ছোটকে বড় করে তোলে বলেই লোকে কেবলি বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্ত্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে, সব কথা শোনে না কিম্বা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিম্বা ঠিক মত পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না কেবলি প্রশ্রয় পায় সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবেই তা নয়। যাকে

আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে ত হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলিনে? কিন্তু কখনো ত মনে করিনে আমি তার অযোগ্য! সবটুকুইত দিব্য অসঙ্কোচে দখল করি! দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিষ যে আমরা পাইনে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জ্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চল্‌তে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের—আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্ম্মই এই যে সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এই জন্যই আমাদের আহার্য্য পদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজন মত নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে?—আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র

আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ বর্জ্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মত আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা

ও দৌর্ব্বল্য জন্মে তা নয় যে সমস্ত অতিবেদনা-শীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়—আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে ;—যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সাম্‌নে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্ম্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম কর এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম কর—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে—যিনি শিব যিনি শিবতত্ত্ব তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করচি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্চি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলি ছাড়তে হবে এবং এগতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে যেখানে পৌঁছে বল্‌তে পারি এই খানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্ম্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া—তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন

না করলে দুটোতে কেবলি ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলি বলি আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসার বলে তোমাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে তাহলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাইনে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্ম্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তাহলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না—তখন দাসের মত সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না

বল্‌তে পারে যে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বল্‌তে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড় বড় দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনো মতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চল্‌বে না—সে বড় দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আস্‌ব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনি সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—তাহলেই যথার্থ ভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীন ভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মত জগৎকে দেখ্‌তেই পাইনে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এই জন্যই বলছি যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়—যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না সংসার তারই হয়। সেই সত্য করে বল্‌তে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায়—কিন্তু ঘোড়া কি বল্‌তে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাৎ কি? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্ত্তৃত্ব তারই।

যদি কর্ত্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এই জন্য গীতা সেই যোগকেই কর্ম্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করলেই কর্ম্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্ম্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্ম্মী হইনে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্ম্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড় হয় তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি

দেওয়াটাই একমাত্র বড় হয় তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্ম্মটা মুক্তি-বিবর্জ্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্ম্মবিহীন হয় তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিষটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারিনে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এই জন্যে খৃষ্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড় কঠিন। কেননা যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু

ধনই যে তাকে বাঁধে—এই বন্ধটাকে যে যতই বড় করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আস্‌চে প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আস্‌চে আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মত আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরণা ঝরতে থাক্—আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্—এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্, তার পরে ক্রমে এটা ক্ষইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক্। দেখ, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ—অন্তরের সঙ্কোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন

প্রসারিত হয়ে আসচে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্চে, শান্ত হচ্চে, কর্ম্ম সহজ হচ্চে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্চে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানব জীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠ্‌চে।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনো মনের মধ্যে এসে পৌঁছল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয় ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে—ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা ত মুক্তি চাচ্চিনে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে—আমরা যে ইচ্ছা করে খুসি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি—আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন—এতবড় জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে,

মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে ; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্ব্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জান্‌ত তার সমস্তই বিলুপ্ত—সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে ত একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেই রকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জ্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ ত শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত

কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জ্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কি হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কি হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কি হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কি হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে তাহলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কি হবে? পুতুল কিন্‌বে। পুতুল কিনে কি হবে? খেলা করবে। খেলা করে কি হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়—খুসি হবে। খুসি হয়ে কি হবে এ প্রশ্ন কেউ কখনো অন্তরের থেকে বলে না।

ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিন উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করচি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড় ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখ্‌বার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্চে—অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্চে—এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠ্‌বে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ হয়ে আস্‌চে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের

মন্ত্র আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-মন্ত্রের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোট দরজাও যদি খুলে রাখ তা হলে দেখ্‌বে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌চে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরচে না—ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মত হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে ত আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারী তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আস্‌চেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্চেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই

আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চল্‌বে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখ্‌লে হবে না, তার রসিদ চাইলে চল্‌বে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮শে অগ্রহায়ণ। ১৩১৫

প্রেম

বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেচেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্চেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্ম্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোলোনা তার জন্যে আর একটা সত্যকে মান্‌তে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে সয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো সরিককে মানিনে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে; আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ ত হল তত্ত্ব কথা। তিনি সত্য একথা জান্‌লে কেবল জ্ঞানে জানা হয়—এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়? এই সত্যের কি কোনো রসই নেই?

তা বল্লে চল্‌বে কি করে? সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেম্‌নি সমস্ত রসও যে তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেচেন—তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জান্‌লে জানায় সার্থকতা হয়।

তাহলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে

তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না—ভেদ ভেদই থাকৃত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলি হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে—সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়—তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে—সেই জন্য সমস্তকে মিলতেই হয়—সেই জন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কি হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকৃতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্ত বস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ কর্ব্বে তাহলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণরূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে, তাহলে মন

আর কথাটি কইতে পারে না—এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমত অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে "তাহলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে ত ত্যাগই নয়—আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চির-কাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহঙ্কারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের

উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য্য একবারে কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহঙ্কারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আল্‌গা হয়ে আসে। তা হলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব? হাঁ মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কি পাব? মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করচেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জ্জন করচেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি

হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্চে না—সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাৎই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারো কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চল্‌তে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই কথাবার্তা

হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এস—যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই—কিন্তু দ্বারী বারবার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই। খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার ফিরে আসতে হল—বারবার।

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইষ্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইষ্টেশনেই আমাদের নাম্‌তে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের

টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে তা চল্‌বে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

সামঞ্জস্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্ম্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মত পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্ব্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী ;—হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং

অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধ-রূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারিনে—কিন্তু স্বার্থ জিনিষটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেচেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেচেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্চি দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও ত যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এযে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলি

বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্য্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎ-শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায়

দেখতে পাই। সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেই খানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেই-খানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—তারা বিপরীতপর্য্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ

এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করচেন। এই দেওয়াপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই, "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেই জন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই কোনো কালে তাঁর কাছে যাইনে। আমাদের

উপনিষৎ বলেচেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারিনে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি— তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসাসহ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে ত এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায়নি। শুধু বাক্য ফেরে না মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে—এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেইত যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্চে সমস্ত না জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে

জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জান্‌তে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জান্‌তে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে একদিকে কিছুই জানিনে সেখানে অন্যদিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্চেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করচে—তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ত দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াৎ করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাস করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিষটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিষ পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা

এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্চে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর ত কেবলমাত্র মুক্ত নন তাহলে ত তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হলে সৃষ্টিই হতনা এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্য্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যেরূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই ত তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেইত তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন

তাহলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড় কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে, সখিত্বে, পতিত্বে, বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড় কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটকে মনে করি তুচ্ছ, বড়কেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিষটা যে কি তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য্য রহস্য। এই সীমাইত অসীমকে প্রকাশ করচে। এ কি

অনির্বচনীয়! এর কি আশ্চর্যরূপ, কি আশ্চর্যগুণ, কি আশ্চর্যবিকাশ! একরূপ হতে আর একরূপ, একগুণ হতে আর এক-গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরইবা নাশ কোথায়! এরইবা সীমা কোন্‌খানে! সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তন পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্চে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড় সাধ্য আছে কার! বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই

তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্চে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্চে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এত বড় অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে!

অধীনতা জিনিষটা যে কত বড় মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্ম্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসঙ্কোচে বলেছে ভগবান জীবের .কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেচেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেচেন—নইলে আমরা আছি কি করে?

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর

সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করচেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি ত খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভাল লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্চেন কেন? এই ভাল লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলি বল্‌চেন তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্চি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে!

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভাল করে না মিল্‌চে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজ্‌চে। সেইখানে

কত দুঃখ যে জাগ্‌চে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্চে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্চে—তাই ত, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

কি চাই ?

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কি ফল চেয়েছিলুম ? আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মত আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরো অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে আমার এই জ্বালাটা জুড়োক্ ; হয়ত জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা ত স্থায়ী হয় না—এমন কি, তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায় তবে সে শান্তিও পায় না স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চল্‌বে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ঐ যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্যে একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপর এসে পড়ে সেটাতে আমাদের ভুলায়,—আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি আমাদের উপাসনা সার্থক হল— কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখ্‌তে পাইবেন।

কেননা, দেখ্‌তে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখ্‌তে পাই সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যে রকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠাণ্ডা রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃদু রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকচে না। ছোট

কথা অত্যন্ত বড় করে শুন্‌চি, ছোট ব্যাপার অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠ্‌চে।

ভার বাড়ে কখন্; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হাল্কা জিনিষ আমরা সহজেই তুল্‌চি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখ্‌চি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টান্‌চে, অহঙ্কার ভিতরের দিকেই টান্‌চে, এই জন্যেই সব জিনিষই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠ্‌চে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ঐ ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপ্‌চে—সব জিনিষই আমাকে ঠেসে ধরেচে—সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্চে—ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কি?

এই চাপটা হাল্কা হয় কখন? প্রেমে। তখন যে ঐ টানটা বাইরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয় সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। অন্যদিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সার যে ভার ছিল আজ বত্রিশ পয়সার সেই ভার। অন্য দিন যে কাজে হয়রান্ হয়ে পড়তুম আজ সে কাজে ক্লান্তি নেই—হঠাৎ কাজ হাল্কা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয়; প্রেমে যে আমাকে

বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হোক্ আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি হাল্কা হতে না থাকে তবে বুঝ্‌ব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেম্‌নি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোট টুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড় তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাহলে বুঝ্‌তে হবে প্রেম জোটেনি— আমাদের বরণসভায় বর আসেনি।

তবে আর ঐ শান্তিটুকু নিয়ে কি হবে? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখ্‌বে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই তাতে অশান্তিও আছে; জোয়ারের জলের মত কেবল যে তার পূর্ণতা তা নয় তারই মত তার গতিবেগও আছে;—

সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখ্‌বে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উল্টো টানে টেনে নিয়ে যাবে—তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলি গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না—সে হুহু করে ভেসে চল্‌বে!

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকৃতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছ, সুখের দিন হোক্ দুঃখের দিন হোক্, বিপদের দিন হোক্, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন

প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্তে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারিনে—কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে দুঃখ যে অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তি-কেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না—আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও আসবে—সে যে-কোনো বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু, তোমাকে চিনেছি।

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

প্রার্থনা।

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য্য পল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্দ্ধগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনামন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল ত এসব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, না, তা হবে না, তবে কি না উপকরণবন্তের যেমনতর জীবন

তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘর দুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্ত্তে বলে উঠ্‌লেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কি করব! এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি ত চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে একথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠ্‌লেন "আমি যা চাই এতো তা নয়!"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি—সেই ধ্বনি তাঁদের

মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম এমন সময়ে হঠাৎ একপ্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখ। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কি যে আনচে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বল্‌চে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদ, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না কর, এই নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট করে বল্‌তে পারচে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল

হবে না, সে মনে করচে হয় ত আমি যা চাচ্চি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মান্‌চে না। সে ভাব্‌চে হয় ত পাওয়ার পরিমাণটা আরো বাড়াতে হবে—টাকা আরো চাই, খ্যাতি আরো দরকার, ক্ষমতা আরো না হলে চল্‌চে না। কিন্তু সেই আরোর শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন একমুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জ্জনার মত ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ঐ যে বলেছিলেন "আমি যাতে অমৃতা না হবো তা নিয়ে আমি কি করব" তার মানেটা কি? অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা? অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে

জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টি"কে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না একথা নিশ্চিত। তবে তিনি কিভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন?

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা ত কেবলি একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই ত স্থির হয়ে থাকতে পারচিনে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্য্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না—যেটা পেলে সে বলতে পারে এ ছাড়া আমি আর

বেশি চাইনে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠ্‌বে না! তা হলেই ত মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্‌ মানুষ এমন কোন্‌ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বল্‌তে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই ত স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন এসব নিয়ে আমি কি করব! আমি যে অমৃতকে চাই!

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ ত অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কি! আমরা জানি অমৃত কি। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাইনি তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠ্‌ত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখ্‌তে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝ্‌তে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বল্‌তে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌!"

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কি স্পষ্ট, কি সত্য, কি মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত

যুক্তি পরিহার করে কি অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাইনে আমি প্রেম চাই—এ কি কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনা-রূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্ব-মানবের বিরাট্ ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আস্‌চে!

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনি জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অসতোমা সদগময়, তমসোমা

জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়—আবিরাবীর্ম-এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কি চাই অথচ কি নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণী-হৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে। —হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মত নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ,

তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম্ম-এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি ত চির-প্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক্। হে রুদ্র হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মত বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ!

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন কর—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর